অঞ্জলী লহ মোর

ডালিয়া নিলুফার

(বাংলা-সিডনীর দশ বছরের সাফল্যে এর সকল লেখক, পাঠক এবং সম্পাদককে অভিনন্দন জানিয়ে এই লেখা)

জীবনের প্রথম সব কিছুর প্রতি মানুষের কেন জানি একটা আলাদা দুর্বলতা থাকে। ভালো মন্দ যাই হোক, তাকেই বিশেষ বলে মনে হয়। স্কুলে প্রথম দিনটা। সংসারের প্রথম সন্তান। প্রথম পুরস্কার। প্রথম ভয়। প্রথম চুম্বন। নিষ্ফল প্রেম হলে, তাও। কেন জানি কিছুই ভোলে না মানুষ। ‘‘একদিন বাঙ্গালী ছিলাম রে’’ বাংলা সিডনীতে আমার প্রথম লেখা। সিডনীর বাঙ্গালীদের কাছে আমি তখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত। অখ্যাত তো বটেই। এরপর লিখতে লিখতে কত মানুষের সঙ্গে যে জানা শোনা হয়ে গেল! কত বন্ধুত্ব! কত বন্ধন! আজ একসঙ্গে এত কিছু মনে পড়ছে যে শেষ পর্যন্ত এই লেখা ঠিক মত আমার হাত দিয়ে বেরুলে হয়! আর মনেরও যা অবস্থা!

শিল্পী হিমাংশু গোস্বামীর গানের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। বারউড গার্লস হাই স্কুল অডিটোরিয়ামে। বাংলা-সিডনীর সম্পাদক আনিস ভাই’র সাথে ঐ দিনই প্রথম দেখা। কার্ড পেয়ে তার ওয়েব পত্রিকাটি সম্পর্কেও জানলাম। কথার ফাঁকে জানতে চাইলেন লেখালেখির অভ্যাস আছে কিনা। বললাম ‘‘লিখিনি কোনদিন। তবে চেষ্টা করে দেখা যায়।’’ কথার কথা। লেখা কি আর চেষ্টা করে করার জিনিষ? মনে পড়ছেনা, সেদিন তিনি আমাকে লেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিনা। তবে সেই ছিল আমার শুরু। বাড়ী ফিরে কেন জানি লেখার চিন্তাটা আর গেলইনা।

একা থাকতাম বলে মাঝে মাঝে লেখার নেশা হোত। লিখতাম। তবে লুকিয়ে। কেউ দেখলে হাসবে, সেই ভয়ে। পরে টের পেলাম, যাদের সাথে থাকি, সেই বাড়ীর মেয়েটি আমার খাতা লুকিয়ে পড়ে। যদ্দুর মনে হয়, সেই ই আমার প্রথম পাঠিকা। আমি কাজ থেকে ফিরলে সে তার এই অপকর্মের কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করত এবং আরও নির্দ্বিধায় হাসত। তার সেই হাসি দেখে আমার যে কি অবস্থা হোত তখন!

খুব বেশী লিখিনি। সেই সাধারণ লেখাগুলি তবু পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল কোন কারণে। সিডনীর জন-জীবন চোখে যতটুকু দেখেছিলাম অতটুকু নিয়েই আমার প্রথম লেখা। বাংলা-সিডনীতে পাঠিয়ে দিলাম। কিছু মনে করে না। এমনই। লেখা পাঠিয়েছিলাম, না গহীন কুয়োর মধ্যে বালতি ফেলে পানি টেনে তোলার চেষ্টা করেছিলাম কে জানে! তবে আনিস ভাই সেটা যত্ন করে ছাপিয়েছিলেন। পরদিন দেখি, বেশ কয়েকটি চিঠি আমার লেখার নিচে পায়রার মত উড়ে এসে বসেছে। প্রখ্যাত কলামিস্ট অজয় দাশগুপ্ত, বিজ্ঞানী ডঃ আবেদ চৌধুরী, লেখক ডঃ কাইউম পারভেজের পাঠানো অপ্রত্যাশিত অভিনন্দন। অবিশ্বাস্য প্রেরণা। মন ভরে গেল। খ্যাতি এবং মন সব সময় একসাথে থাকেনা। এই মানুষগুলির ছিল।

এর বেশ কিছুদিন পর কোন একটা অনুষ্ঠানে দেখা হয়ে গেল আমার অত্যন্ত প্রিয় গায়ক এবং প্রিয় মানুষ সিরাজুস সালেকিন ভাইয়ের সাথে। মানুষ যার সুরের মায়ায় পড়ে যায়। আর মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে। তিনিই স্বস্নেহে বলেছিলেন- “তোমার লেখাগুলি পড়ি, ভালোলাগে’’। এত বড় গুণী মানুষের কাছ থেকে কথাটা শুনে আমার ভিতরে যে কতখানি শক্তি সঞ্চারিত হলো! স্নেহ ভালোবাসা ছাড়া মানুষ মানুষ হতে পারেনা, লেখক হওয়া তো দুরের কথা। শ্রদ্ধেয় সালেকিন ভাইয়ের কাছ থেকে সেই স্নেহময় প্রেরণা আমি পেয়েছি। বরাবরই। আমার মত অত্যন্ত সাধারণ এবং পুরোপুরি অচেনা এক লেখকের জন্যে যা ছিল এক বিশাল সূর্য দেখার আনন্দ।

লিখতে লিখতেই পেয়ে গেছি কবি মাহমুদা রুনুর মত বন্ধু। মনে পড়ে, পরিচয় পেয়ে বৈশাখী মেলায় আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আহা! সে এক মুহূর্ত! অসাধারণ মনের মানুষ। ছিলেন কবিতা পারভেজ। শ্রদ্ধেয়, প্রয়াত এম আর আখতার মুকুলের সুযোগ্য কন্যা। যার গান এবং রসবোধ সকলকে মুগ্ধ করে। আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং কাছের এক মানুষ। আপন জন ছেড়ে থাকার যে কষ্ট, সেই কষ্টকে তারা কোন দিনই আমাকে বুঝতে দেননি।

সিডনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মিজানুর রহমান তরুন। একুশে বেতারের পরিচালক। সিডনীর বাঙ্গালীদের জন্যে যিনি প্রথম বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করেন। লেখালেখির কারণে যার সাথে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং যিনি আমাকে গণ-মাধ্যমের কাজ শিখিয়েছেন। প্রবাসে এই বীর মুক্তিযোদ্ধার অবদান কে না জানে?

লেখক তৈরি করা কতখানি সহজ জানিনা তবে মানুষের মধ্যে লেখার ভাবনা জন্মে দেয়া এক বিরাট কাজ। আনিস ভাইর সেই কৃতিত্ব আছে। যিনি সাধারণ হাতের কাছ থেকেও আদায় করে নিয়েছেন অসাধারণ কিছু লেখা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেধাবী এবং সৃজনশীল মানুষগুলিকে বলতে গেলে প্রায় এক গ্রন্থিতে বেধে ফেলেছেন।

সিডনীর লেখালেখির আকাশটা ছোট। তবু আছেন অজয় দাশগুপ্ত, ডঃ কাইউম পারভেজ, কবি মাহমুদা রুনু, হোসেন মোফাজ্জল, দিলরুবা শাহানা, আতিক রহমান, আহমেদ সাবের, আল নোমান শামীম, ডঃ মমতা চৌধুরী, ডঃ আবুল হাসনাত মিল্টন, শাফিন রাশেদ, ডঃ শামস রহমান, আশীষ বাবলু, জন মার্টিন। সেই আকাশে যারা নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করেন।

একজন লেখক বহু ভাবে তার পাঠককে গড়ে নিতে পারেন। সাহিত্যের সেই ক্ষমতা আছে। তার চিন্তার সুস্থ্যতা পরিচ্ছন্ন আলোর মত। বিশুদ্ধ বাতাসের মত। যা পাঠককে বাঁচায়। আনন্দে। উদ্দীপনায়। আর পাঠকও স্পষ্টতঃ এই টুকুই চায়।

যদিও লেখালেখির জগতে ঘটে গেছে এক আশ্চর্য পরিবর্তন। কেউ কেউ লিখছেন। তবে কি লিখছেন, কেন লিখছেন, কি তার দায়বদ্ধতা -বোঝা যায়না। কলমের খোঁচা সামান্য। সামান্যতেই তার মান-মর্যাদা থাকে। পাঠক এবং সাহিত্যিক মাত্রই তার উপভোগ্যতা বোঝেন। কিন্তু কিছুকিছু লেখা পড়লে বোঝা যায় এরা সাহিত্য পড়া বন্ধ করেছেন বহু আগে। পাঠক কৌতূহলী সত্য, অবিবেচক নয়।

দেখেছি সিডনীর সমস্ত বাঙ্গালীরা মিলেমিশে একটা গোটা পরিবার। পৃথিবীর আর সব পরিবারের মত এখানেও আছে সুসম্পর্কের ইতিহাস। আছে আনন্দ এবং বিরহ। শোক এবং সান্তনা। অনাকাঙ্ক্ষিত শরিকি ঝামেলার বিবাদ, তাও। সুখ এবং দুঃখের এ এক আশ্চর্য বুনন। লেখালেখির কারণে সেই মানুষগুলির সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাদের কাজগুলির সাথে কোন না কোন ভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম। দেখেছি কি ভাবে তারা তাদের মেধা, শ্রম এবং সদিচ্ছা দিয়ে নিঃস্বার্থে কাজ করে গেছেন। কখনও দল বেঁধে। কখনও একা একা। আমার মনে হয়, আমার লেখা আসলে লেখা ছিলনা, ছিল ছোট এক ডিঙ্গি নৌকার মত। যা আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল এই অসাধারণ মানুষগুলির কাছে।

বাংলা-সিডনী আমাদের সবার কাছে এক স্বপ্নের বন্দর। এখানে আমরা নৌকা ভিড়িয়েছি। একে অন্যের সান্নিধ্য পেয়েছি। সাহচর্য পেয়েছি। পারস্পরিক সুসম্পর্কও তৈরি হয়ে গেছে। এও এক বড় পাওয়া। বাংলা-সিডনীর দীর্ঘদিনের এই সাফল্য শুধু এটুকুই প্রমাণ করে যে, মানুষ আসলে ভালো কিছুর সাথেই যুক্ত হতে চায়।

বাংলা-সিডনীর আঙিনা আরও প্রশস্ত হোক। শ্রীময় হোক। এইখানে জড়ো হোক সমস্ত সৃজনশীল মানুষগুলি। এই খোলা আঙিনায় দাড়িয়ে তারা প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিক । শুভময় হোক এর প্রতিটি মুহূর্ত। ভালোবাসার চেয়ে সেরা কিছু নেই। আমার সমস্ত প্রিয় লেখক এবং পাঠকদের ভরপুর তাই ই দিলাম। আনিস ভাইকে আমার অভিনন্দন এবং একই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই । আমার বিশ্বাস প্রতিটি সৎ কাজের কেবল শুরু আছে। শেষ নেই।

ডালিয়া নিলুফার –
প্রাবন্ধিক